স্বামী বিবেকানন্দের আর্থ-সামাজিক ভাবনা ঃ একটি রূপরেখা

স্বামী ঋতানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে অর্থনীতিবিদ বা সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী গভীরভাবে অনুশীলন করলে দেখা যায়, তাঁর চিন্তার মধ্যে রয়েছে সমাজ এবং অর্থনীতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার অজস্র এবং অফুরন্ত ইঙ্গিত। সেদিকটিরই সামান্য একটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করছি। সেখানেই হয়তো বর্তমান সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রাসঙ্গিকতা। বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই আমার মনে একটি সমুদ্র-সৈকতের ছবি ভেসে ওঠে। বেলাভূমিতে বালুকারাশির ওপর দিয়ে কত মানুষ হেঁটে চলেছে। তাদের পদচিহ্ন পড়ছে। আবার কিছুক্ষণ পরেই জল বা ঝোড়ো হাওয়া সেই পদচিহ্নকে মুছে দিচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের বুকে এরকম কিছু ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় যাঁরা শত শত বছর মানুষের মনের মণিকোঠায় সযত্নে লালিত হন। শুধু লালিত হন তাই নয়, তাঁদের চিন্তা-ভাবনা মানুষকে উদ্দীপিত করে উজ্জীবিত করে নতুন সমাজ গড়ার সফল প্রয়াসে। স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসংশয়ে সেইরকম এক পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যেকোনও যুগের সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানে যাঁদের চিন্তাভাবনার মধ্যে পাওয়া যাবে সমস্যাগুলির সমাধানের সূত্র বা চাবিকাঠি, তাঁদেরই আমরা বলি সে-যুগের প্রফেট বা যুগনায়ক। যুগ-সমস্যা সমাধানের যোগ্যতাই হল প্রাসঙ্গিকতার সর্বোচ্চ মাপকাঠি।

আমরা জানি, মার্কসবাদ হল আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক তত্ত্বের ও সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের উপযোগী একটি বলিষ্ঠ মতবাদ। কার্ল মার্কস একজায়গায় উল্লেখ করেছেন : "Philosophers have hitherto only tried to explain the world. The real problem is how to change it." অর্থাৎ, এতদিন দার্শনিকেরা শুধুমাত্র জগৎকে ব্যাখ্যাই করেছেন। আসল কথা হল তাকে পরিবর্তন করা। দার্শনিকদের কাজ হল ঈশ্বর, জীব এবং জগৎ—এদের স্বরূপ সন্ধান এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করা। স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিকতা এই লৌকিক ধারণাকে ছাড়িয়ে গেছে। মার্কসের মতো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষ ছিল সমাজের পরিবর্তন। ধর্ম এবং একটি দেশের জাগতিক উন্নয়ন—এই উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গভীর গবেষণা করেন বিখ্যাত জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ Max Weber। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'The protestant Ethic and The Spirit of Capitalism'-এ দেখিয়েছেন কিভাবে Martin Luther ক্যাথলিক চার্চের অন্যতম মূলনীতি (basic tenet) দরিদ্রতাকে (poverty) অস্বীকার করে ক্যাথলিক চার্চ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে সমগ্র পৃথিবীর অসংখ্য দেশে Protestant চার্চের প্রসার ঘটিয়ে সেইসব দেশের

অর্থনীতিতেও এক অভিনব রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। সমকালীন অন্যান্য সমাজতত্ত্ববিদ, রাজনীতিবিদ এবং অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে এবং একই যুক্তির অবতারণা করে Max Weber তাঁর অপর একটি গ্রন্থ 'The Religion of India'-তে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধঃপতনের জন্য হিন্দুধর্মের জগৎ-বিমুখ দর্শন বিশেষত বেদান্তের 'মায়াবাদ' দায়ী। আর এরই জন্য উন্নত সংস্কৃতি, প্রচুর ধন এবং মার্জিত বৌদ্ধিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর একটা উন্নত সমাজ গড়তে ব্যর্থ হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দই তৎকালীন দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষের অধঃপতন বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর সমাজ গড়তে না পারার জন্য ধর্মকে দায়ী করেননি। বরং তাঁর মতে এর কারণ—ধর্মের উচ্চ তত্ত্বসমূহকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে না পারা, সহানুভূতির অভাব এবং হৃদয়হীনতা। এতদিন ভারতীয় দার্শনিকেরা জগৎকে ব্যাখ্যা করতে এবং বন্ধনের হাত থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে ধর্মকে প্রয়োগ করেছেন। অপরপক্ষে স্বামীজি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে ধর্মকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। জাতীয় সমস্যার সমাধানে বিশেষত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনসাধনে ধর্মকে তিনি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বলে মনে করেছেন। সমগ্র ভারত পরিক্রমা করে সমাজের উচ্চ অভিজাত সম্প্রদায় থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে স্বামীজি দেখেছেন ভারতবর্ষকে—এ যেন এক নতুনভাবে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার! দেশের সমস্যাকে দেখেছেন, জেনেছেন সমস্যার কারণ, উদ্ভাবন করেছেন সমাধানের উপায়। আবিষ্কার করেছেন, ভারতবর্ষের বর্তমান দুরবস্থার জন্য ধর্ম দায়ী নয়; ভারতবর্ষের শাস্ত্রে ধর্মের যে অতি উচ্চাদর্শ রয়েছে, ব্যবহারিক জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ করতে আমরা ব্যর্থ হওয়ায় সমাজে এত বিভেদ, অসাম্য আর কুসংস্কার। এসময়ে তাঁর চিন্তার মূল কেন্দ্রে রয়েছে ভারতবর্ষ। কন্যাকুমারিকার শিলাসনে বসে ধ্যানসিদ্ধ বিবেকানন্দ ধ্যান করেননি কোনও দেব-দেবীর বা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের। এতদিন ধ্যানকে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধির বা অনুভূতির প্রক্রিয়া বলে জানা ছিল। এই প্রথম আমরা দেখি, স্বামীজি ধ্যানকে জাগতিক সত্য বা দেশমাতৃকার পুনরুজ্জীবনের পন্থা আবিষ্কারের প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি ধ্যান করেছেন ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষ যেন তাঁর ইষ্ট। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টি বলে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভারতকে বিশ্লেষণ করে জেনেছেন—ভবিষ্যৎ ভারত অতীতের সমস্ত গৌরবকে অতিক্রম করে যাবে।

ধর্মের অনেকগুলি প্রচলিত সংজ্ঞার মধ্যে বৈশেষিক দর্শনের উদ্‌গাতা কণাদের সংজ্ঞাটি ছিল স্বামীজির খুবই মনঃপুত। কণাদের মতে, যা দ্বারা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স লাভ হয় তাই ধর্ম। স্বামীজিই প্রথম ধর্মজগতের মানুষ যিনি প্রশ্ন করেছেন, ধর্ম—যা মুক্তি দিতে সমর্থ তা কি জাগতিক সমৃদ্ধি দিতে সমর্থ হবে না? যে-ধর্ম বিধবার অশ্রু মোছাতে পারে না, অনাথের মুখে একখণ্ড রুটি দিতে পারে না—স্বামীজি বলেছেন, তিনি সে-ধর্মে বিশ্বাস করেন না। যতদিন দেশের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, স্বামীজির মতে, তাকে খাওয়ানোই হবে তাঁর ধর্ম। যে-ধর্ম মানুষকে পেট ভরে খেতে দেয় না, তা নাকি অনন্ত স্বর্গভোগ করাবে—এরকম স্তোকবাক্যে

স্বামীজির আস্থা ছিল না।

এক অভিনব কর্ম-দর্শন জগতের সামনে উপস্থাপন স্বামী বিবেকানন্দের আর্থ-সামাজিক ভাবনার একটি বিশিষ্ট অবদান। যেকোনও কর্ম যা আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করতে সহায়ক তাই স্বামীজির মতে ধর্মীয় কর্ম বা কর্মযোগ। সুতরাং কর্মের ব্যাপ্তিতে সকল কর্মই আধ্যাত্মিক, কোনওটিই শুধু ঐহিক নয়। যেখানে স্বামীজির ধারণাতে কর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশে সহায়ক, সেখানে মার্কসের ধারণাতে শ্রম (labour) হল আত্মোপলব্ধির (self realization) সহায়ক। এখন মার্কস আত্মোপলব্ধি বলতে কী বুঝিয়েছেন সেটি Eric Fromm-এর মতে : "The very aim of Marx is to liberate man from the pressure of economic needs so that he can be fully human."

একজন শ্রমিক তার শ্রমের দ্বারা নিজেকে পূর্ণ করে এবং তার ফলে নিজের এবং জগতের যুগপৎ রূপান্তর ঘটায়। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বিচ্ছিন্নতাবোধের (alienation) জন্য অর্থাৎ শ্রমিক তার শ্রমের সঙ্গে একাত্মবোধ না করায় নিজেকে পূর্ণ করতে সমর্থ হয় না। এর ফলে তার জীবনে ব্যর্থতা, দুঃখ এবং দ্বন্দ্বের অবসান হয় না। পক্ষান্তরে, স্বামীজি কর্মকে চরম জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু যেকোনও কর্মই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশে সমর্থ এবং জীবের সেবা মূলত শিবের বা ঈশ্বরেরই সেবা, সেহেতু কোনও কর্মই তাঁর মতে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি করে না; বরং কর্ম বা সেবা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটি স্থায়ী মাধ্যম। যখন মানুষ অনৈতিক কাজ করে তখন সেই দেবভাবটি আবৃত হয়ে তার দেবত্বকে প্রকাশ করতে দেয় না, ফলে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রকৃত বিচ্ছিন্নতাবোধ ঘটে তখন—যখন আমাদের আত্মা থেকে বা স্বরূপ থেকে আমরা আমাদের বুদ্ধি বা মনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখি। স্বামীজি লক্ষ করেছেন—দারিদ্র্য, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শিল্পায়ন ইত্যাদি যা কিছু দ্বন্দ্ব বা সমস্যার সৃষ্টি করুক না কেন, মানুষ নিজের আত্মা বা স্বরূপ থেকে যতক্ষণ নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে না করছে ততক্ষণ তার জীবনে হতাশা বা ব্যর্থতা, যা বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিণাম তা আসতে পারে না। তাই একটি জীবনদর্শন বা কর্মদর্শন বা কর্মসংস্কৃতি সামনে রাখা চাই, যেটি জীবনের উদ্দেশ্য বা অর্থকে প্রকাশ করবে এবং প্রতিটি কর্মকে জীবনের সেই উদ্দেশ্যসাধনে অর্থপূর্ণ মনে করবে। এখানে যেকোনও কর্মই যে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশে সমর্থ—এই মৌলিক ধারণা বা বিশ্বাসের সার্থকতা। যেকোনও কর্ম ধর্মীয় বা জাগতিক, পুরনো বা নতুন—তাকে কর্মযোগের আওতায় এনে স্বামীজি মার্কসীয় বা অন্যান্য ঐহিক দর্শনের প্রতিবাদরূপে কর্মযোগকে একমাত্র বিকল্পরূপে প্রতিস্থাপন করেছেন।

একটি দেশের উন্নয়নের মূল লক্ষ্য এবং তার মাপকাঠি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদেরা যে ব্যাপক আলোচনা করেছেন তার নির্যাসটুকু এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। অর্থনীতিবিদ Michael Todaro এবং Denis Goulet-এর মতে উন্নয়নের মূল লক্ষ্য তিনটি : (১) মানুষের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা (Self-sustenance), (২) প্রতিটি মানুষ ও গোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা লাভ

(Self-esteem) এবং (৩) স্বাধীনতা বা প্রতিটি মানুষের সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি (Freedom from servitude)।

অর্থনীতিবিদ Dudley Seers কোনও দেশের উন্নয়ন ঘটেছে কিনা তার তিনটি মাপকাঠির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন দেখতে হবে : (১) দারিদ্র্য কমেছে কিনা? (২) বেকারত্ব ঘুচেছে কিনা? এবং (৩) বৈষম্য কমেছে কিনা?

Todaro বলেছেন Seers যে প্রশ্ন তৈরি করেছেন সেগুলিকে নিম্নোক্তরূপে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা প্রয়োজন : (১) মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি যথা—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে কিনা। (২) তার যথোচিত মর্যাদালাভ ঘটেছে কিনা, তার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি অন্য দেশের কাছে ও নিজের কাছে লাভ হয়েছে কিনা। (৩) সে দেশের মানুষের সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি, আর্থিক উন্নতি এতে দিতে পেরেছে কিনা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের তিনটি শর্ত : (১) আর্থিক নিরাপত্তা, (২) জাতীয় মর্যাদা এবং (৩) পূর্ণ স্বাধীনতা।

স্বামীজির জীবন, কর্ম ও বাণীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনবোধ। অন্যান্য চিন্তাবিদ বা দার্শনিকদের মতো একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক পরিকাঠামোর মধ্যে জীবন গড়ে তুলে পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্যর প্রচারকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেননি। তিনি জীবনকে দেখেছেন সাদা চোখে। তাই যেকোনও সমস্যার মূলে গিয়ে তিনি তার কারণকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং সমাধানের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। সর্বদাই তাঁর মানসিক সত্তার মধ্যে ছিল একটি মৌল প্রত্যয় এবং এই মৌল প্রত্যয়টিই তাঁর জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কী সেই মৌল প্রত্যয়টি? একটি সংগ্রামী চেতনা, একটি বিদ্রোহী ভাব জুড়ে ছিল তাঁর সত্তাকে। তাঁর জীবনের মধ্যে দেখি, সেই সংগ্রামী চেতনাটিই ক্রমবিকশিত হয়েছে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বে এবং পূর্ণতায় সম্পূর্ণ আস্থা এই সংগ্রামী চেতনারই দ্যোতক। তাই প্রচলিত অর্থে সমাজ-সংস্কারক বা অর্থনীতিবিদ না হয়েও স্বামীজির চিন্তাকাশে মানুষের সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার এমন কোনও দিক নেই যা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেনি।

ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণে স্বামীজি সবচেয়ে জোর দিয়েছেন আমাদের পুরনো কিছু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ওপর। তাঁর মতে, বাহ্য সভ্যতা শুধু আবশ্যক তাই নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, এমনকি বিলাসিতা পর্যন্ত, যাতে গরিব লোকের জন্য নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থকে তিনি সব কিছুর ওপর স্থান দিয়েছেন। বুভুক্ষু মানুষকে ধর্ম ও দর্শন শেখানোকে স্বামীজি পাগলামি বলতে দ্বিধা করেননি। বুভুক্ষু মানুষকে ধর্ম ও দর্শন শেখানো মানে, তাঁর ভাষায়, 'নিরন্নের সামনে ভাতের বদলে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড তুলে ধরা'।

আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্ব স্বামীজি বহু আগেই অনুধাবন করেন ঐহিক উন্নতির জন্য। তিনি বুঝেছিলেন, প্রচুর খাদ্যোৎপাদনের জন্য দরকার আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। এমনকি তাঁর মতে, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে রাখার জন্য উদ্বৃত্ত সম্পদ প্রয়োজন। ভারত যখন ধনসম্পদে

পূর্ণ ছিল তখনি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল। যে-দেশের মানুষকে দুটি অন্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, সেখানে ধর্ম বা সংস্কৃতি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছতে পারে না। দরিদ্র দেশের ওপর উন্নত দেশের মতো ধর্ম বা সংস্কৃতির বোঝা চাপানোর ফলে গত কয়েক শতাব্দীতে ভারতবর্ষের leisured class-এর জন্য সমাজকে অতিরিক্ত বোঝা বইতে হয়েছে। এর বিরুদ্ধে স্বামীজির অভিমত—বরং মানুষ একটু সুখে থাকুক, ভোগ করুক এবং এর জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আত্তীকরণ অপরিহার্য। ঐহিকতার প্রতি উন্নাসিক মনোভাব যে ভারতবর্ষের মানুষের তমোভাব প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ তা স্বামীজি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই জোর করে সন্ন্যাস বা ত্যাগের আদর্শকে ব্যাপক হারে প্রচার করাতে প্রকৃতপক্ষে যে সমাজের আর্থিক ও সামাজিক শক্তি হ্রাস পায় তা স্পষ্ট ভাষায় বলতে দ্বিধা করেননি।

সামাজিক অসাম্য নিরোধে স্বামীজি পৌরোহিত্যের অবসান এবং উচ্চশ্রেণির বিশেষ অধিকারের উচ্ছেদ চেয়েছেন। যেখানে একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান, সেখানে বিশেষ অধিকারের দাবি তাঁর মতে শুধু হাস্যকর নয়, প্রচণ্ড অন্যায়। স্বামীজি বলেছেন : আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, ফলে আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পেয়েছি। কিন্তু তারা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল পরালেন। এককথায় আমাদের সমাজ ভয়াবহ, পৈশাচিক। বলেছেন : স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। ভারতকে ওঠাতে হবে, গরিবদের খাওয়াতে হবে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূর করতে হবে। স্বামীজি দেখেছেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণাম—দারিদ্র্য। ইউরোপ থেকে চিঠিতে লিখছেন : "(এসমস্ত দেশ) শাইলকের শাসনে পরিচালিত হইতেছে।... পাশ্চাত্য দেশ শাইলকগণের অত্যাচারে আর্তনাদ করিতেছে।" মার্কসও লক্ষ করেছিলেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দরিদ্ররা দরিদ্রতর হবে।

যেকোনও প্রকার সামাজিক সমস্যার সমাধানে স্বামীজি জোর দিয়েছেন শিক্ষার ওপর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এরকম কোনও সামাজিক সমস্যা নেই, যার সমাধান শিক্ষার জাদুমন্ত্রে না হয়। শিক্ষার প্রসারের ওপর জোর দিয়ে স্বামীজি বলেছেন : "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা।... সমস্ত ত্রুটির মূলই এখানে যে, সত্যিকার জাতি—যারা কুটিরে বাস করে, তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে। প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে হতে তাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মেছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হওয়ার জন্যই তাদের জন্ম। তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের শিক্ষিত করতে হবে।" এছাড়া, যেখানে স্বামীজি বলছেন—'মহম্মদকে পর্বতের কাছে যেতে হবে', তার অর্থ হল শিক্ষাকে জোত বা খামারে নিযুক্ত শ্রমিকের কাছে যেতে হবে, যাতে কৃষকের আর্থিক লোকসান না হয়। আর্থিক লোকসানকে মেনে শিক্ষাবিস্তার স্বামীজি চাননি, বরং আর্থিক অবস্থার উন্নতিকে বজায় রেখে শিক্ষা শ্রমিকের কাছে যাক—স্বামীজি সেটা চেয়েছেন।

সুসংবদ্ধ ও পরিকল্পিত শিল্পায়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিকল্পনাই একমাত্র ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের সমৃদ্ধি বা উন্নতি ঘটাতে পারবে। ভারতবর্ষ ধর্মকে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে যন্ত্রপাতির ব্যবহার করুক—স্বামীজি এটাই চেয়েছেন। মার্কসের dehumanising influence of machine (যন্ত্রের জড়প্রভাব) প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ। ভারতবর্ষ যেহেতু যন্ত্রপাতিকে শুধুমাত্র জড় বলে মনে করে না, বরং cosmic law-এর ব্যবহারোপযোগী tools বলে শ্রদ্ধা জানায়, সেহেতু ভারতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিচ্ছিন্নতাবোধ বা dehumanised effect থেকে মুক্ত থাকবে।

স্বামীজিই প্রথম সন্ন্যাসী যিনি পাশ্চাত্যের জড়সভ্যতার সমৃদ্ধি, দরিদ্রের প্রতি তাদের সহানুভূতি, নারীদের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক ঐক্য দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। স্বামীজি লক্ষ করেছেন পাশ্চাত্যের উন্নতির পিছনে ছিল বিজ্ঞান এবং মুক্ত সামাজিক-রাজনীতিক মনোভাবের প্রভাব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞান এবং গণতন্ত্র হিন্দু রক্ষণশীল সমাজকে কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে পারবে। তাই স্বামীজি নির্দ্বিধায় বলেছেন, বাইরের সঙ্গে ভারতবর্ষের আদান-প্রদান যেদিন থেকে বন্ধ হল, ভারতবর্ষকে সেদিন থেকেই যে যখন চাইল পদানত করল।

স্বামীজির আর্থ-সামাজিক চিন্তাভাবনার মূল উৎস সন্ধানের ক্ষেত্রে স্বামীজির চিঠিতে উল্লিখিত দু'টি সংক্ষিপ্ত সূত্র খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন : "আমি গরিব, গরিবদের আমি ভালবাসি।... আমি শুধু একটি জিনিসই প্রচার করি, তা হল—ভালবাসা, ভালবাসা।" এই গরিবদের প্রতি ভালোবাসা এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে মানুষের দুঃখ-দুর্দশায়, ব্যর্থতা-হতাশায় প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছে। আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে জগৎ পেয়েছে এক বিস্ময়কর চিন্তানায়ককে, যাঁর চিন্তার অমোঘ প্রভাব জগৎকে চিরকাল প্রভাবিত এবং উদ্দীপ্ত করবে—যতদিন না মানুষ জানতে পারে যে, সে এবং ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন। ১৮৯৪ সালে অধ্যাপক রাইটকে স্বামীজি লিখেছেন : "আমি কোনওদিন 'মিশনারি' ছিলাম না, কোনওদিন হবোও না—আমার স্বস্থান হিমালয়ে, পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে অন্তত এই কথা আজ আমি বলতে পারি। হে প্রভু, আমার ভ্রাতৃগণের ভয়ঙ্কর যাতনা আমি দেখেছি, যন্ত্রণামুক্তির পথ আমি খুঁজেছি এবং পেয়েছি—প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।"

কিন্তু আমরা জানি, স্বামীজি কখনোই ব্যর্থ হননি। তাছাড়া ব্যর্থতার যে প্রচলিত অর্থ, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-অভিধানে সেটি কখনোই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর চোখে ব্যর্থতাও জীবনের সৌন্দর্য। কেন? কারণ, তিনি লক্ষ করেছেন, উদ্যোগীর জীবনেই ব্যর্থতা আসে। যে অলস, কর্মভীরু সে তো কাজই করে না; ফলে তার জীবনে ব্যর্থতাও কম। কিন্তু একজন কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে—এতে স্বামীজি দুঃখিত নন, তিনি বুঝতে পেরেছেন সীমিত শক্তি নিয়ে সে বড় কিছুকে পেতে চেয়েছে। সে ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সংগ্রামী চেতনার পরিচয় যে দিয়েছে তাতেই স্বামীজি আনন্দিত। মানবাত্মা মাথা তুলে দাঁড়াতে

চেয়েছে শত বিঘ্নের মধ্যেও—স্বামীজির কাছে এটি শ্রেষ্ঠ শিল্প। সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রতিটি মানুষের জীবনের সাথেই জড়িয়ে থাকে বলে স্বামীজি তা নিয়ে মাথা ঘামাননি, তিনি দেখতে চেয়েছেন সংগ্রাম। ধর্মীয় পুরুষ হয়েও তিনি মধুসূদনের রাবণ-চরিত্র এবং মিলটনের শয়তান চরিত্রে মুগ্ধ। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রাবণ চরিত্র তাই তাঁর চোখে সুন্দর। বীরভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ-সহ লঙ্কার সব বীর যোদ্ধাই যুদ্ধে নিহত। রানি মন্দোদরী এসে রাবণকে নিষেধ করছেন এই ব্যর্থ যুদ্ধে যেতে, তবুও রাবণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নন, নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধে অগ্রসর হতে চাইছেন—এই দৃশ্য স্বামীজির চোখে মহান। সহস্র দুঃখ-বিপদের মধ্যেও মানবাত্মা তার সংগ্রামী চেতনার পরিচয় দিচ্ছে—এই দৃশ্যে স্বামীজি উৎফুল্ল। 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর সেই পঙ্‌ক্তিগুলি তাঁর কাছে প্রিয় : "What though the field be lost?/ All is not lost; The unconquerable will/... And courage never to submit or yield." নচিকেতা ও সাবিত্রী চরিত্র তাঁর কাছে প্রিয়, কারণ মৃত্যুদেবতার মুখোমুখি তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন সামান্য মানুষ হয়েও। একটি সামান্যতম কীট পিঁপড়ের রেল লাইন থেকে নেমে আসার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যেও স্বামীজি দেখেছেন সংগ্রামী চেতনা। এই সংগ্রামী চেতনা বা জীবনবোধ থেকেই গড়ে উঠেছে স্বামীজির জীবন-দর্শন। তাঁর বেদান্তপ্রীতি, মানবতাবোধ, আর্থ-সামাজিক চিন্তা-ভাবনা এই জীবনবোধেই সৃষ্টি। তাই যতদিন মানুষের জীবনে দুঃখ-বিপদ, হতাশা-ব্যর্থতা, ভয়ঙ্কর জ্বালা-যন্ত্রণা থাকবে এবং এসবের থেকে মুক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আলোড়িত করবে, ততদিন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, কর্ম ও বাণী আশার বার্তা ও আলোর দিশারি হয়ে মুক্তির পথ দেখাবে। ❑